‘গীতাঞ্জলি’-কাব্যের ‘ভারততীর্থ’ কবিতা

রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ কবির ব্যক্তিগত দর্শনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।সেখানে বিভেদ ও খণ্ডতার কোনো স্থান নেই।রবীন্দ্র-সাহিত্য-ধারায় আমরা বারে বারে এই ‘ভারত-দর্শন’ দেখতে পাই। সর্ব জাতি এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষ সমাদৃত হয়েছে। ‘গীতাঞ্জলি’-র (১০৬ নং) ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটি এই পর্যায়ের। সাময়িক পত্রে (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৭) প্রকাশের সময় ভারততীর্থের নাম ছিল ‘মাতৃ অভিষেক’। ভারতভূমিকে কবি বলেছেন ‘পুণ্যতীর্থ’। পুণ্যতীর্থ কারণ ভারতভূমি বহু জাতি এবং বহু মানুষের মিলনস্থল। কবির ধর্ম ‘মানুষের ধর্ম’ কবির ঈশ্বর ‘নরদেবতা’ সুতরাং সেই মানুষের আবাস ভূমি পুণ্যতীর্থ হবেই। ভারতভূমি পুণ্যতীর্থ এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ মহামানবের সাগরতীর এবং এই মহামানবের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন ‘নরদেবতা’ এই কল্পনা ররীন্দ্রনাথের নিজস্ব। তাঁর এই ভাব কল্পনার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়। সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানব চরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে।

ভারত বর্ষ মহামানবের সাগর তীর কেন? রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তিনি লিখেছেন :

কবির নিজেকে বলেছিলেন ভারত পথিক, ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথ রূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীতকালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্বে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তি তত্ত্বের আশায় চীন দেশ থেকে তীর্থ যাত্রী। আবার কেই এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থ কামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারত পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেয়া-দেয়া সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে।

এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য। এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে; এ কারণেই ‘ভারতীর্থ’কবিতার শেষ স্তবকে এই উদার উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে :

‘এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার

এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা

মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীড়ে-

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ এখানে বিশ্ব চেতনায় উন্নীত হয়েছে। এরই নাম বিশ্বমৈত্রী।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন, 'ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ ধর্ম্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম্ম বিরোধের।... যখন ধর্ম্মে বিকার উপস্থিত হয় তখনই বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে ওঠে। শুধু হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ নয় সমাজের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। যখন মানুষ মানুষকে অপমান করে, তখন সে দুর্গতি দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হয়; আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। ... বিচ্ছেদের রক্তপ্লাবনে মানব সমাজের প্রতি স্তর কলুষিত হয়েছে।... এই সমস্যা ভারতে বহুদিন থেকে আছে। বিরোধের প্রাচীর তুলে ত সমস্যার সমাধান হবে না। শুভবুদ্ধির আলোক বিকীর্ণ হোক। তবেই আমাদের চিত্ত মুক্ত হবে।... সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাহিরের চুক্তি দ্বারা সে ঐক্য হবে না। আমাদের শুভবুদ্ধি শুভকর্ম্মে যুক্ত হোক।'

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি রক্ষার চরম ও পরম পক্ষপাতি। তিনি ধর্ম, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, লোকহিত, দেশহিত, রাজাপ্রজা, রাজভক্তি, হিন্দু মুসলমান, খৃস্টোৎসব, ধর্ম মোহ প্রভৃতি নামের অসংখ্য কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস লিখে দেশ-বিদেশে কীভাবে সংহতি রক্ষা করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর The Religion Of Man (ইংরেজিতে প্রদত্ত বক্তৃতা) নামক প্রবন্ধ এবং বাংলায় 'মানুষের ধর্ম' নামক দুটি প্রবন্ধ লিখে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের অনুকূলে যথেষ্ট সুযোগ, কারণ এবং প্রয়োজনের যুক্তি দেখিয়েছেন। 'ভারত-তীর্থ' কবিতাটি তাঁর জীবন, সাহিত্য-কীর্তি, দার্শনিক চিন্তা, মানবপ্রীতি, গভীর অধ্যাত্ম-চেতনা ও বিশ্ব-মৈত্রী ভাবনার একত্রে গ্রথিত একখানি মনোহর মালা। 'আত্মশক্তি' নামক পুস্তকের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষে সর্ব প্রধান চেষ্টা ছিল।' রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক মানসপটে একজন কুসংস্কার মুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির কবি ও চিন্তাশীল মনীষীরূপে পরিচিত।

রবীন্দ্রকবিতায় ভারতবোধ ও স্বাদেশিকতা বিষয়ে আলোচনায় কবিতায় ভারত বোধের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা গভীর, ব্যাপক এবং বিশ্বমৈত্রির নামান্তর। সমগ্র গীতবিতানে এ রূপ গভীরতা ও ব্যাপকতা থাকলেও 'স্বদেশ' পর্যায়ের সঙ্গীতে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য আছে বলে মনে হয় না। অবশ্যই এই স্বদেশ পর্যায়ের সঙ্গীত 'ভারততীর্থ'।